বাংলা ছন্দ

ছন্দ : কাব্যের রসঘন ও শ্রুতিমধুর বাক্যে সুশৃঙ্খল ধ্বনিবিন্যাসের ফলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তাকে ছন্দ বলে। (বাঙলা ছন্দ : জীবেন্দ্র সিংহরায়)

অর্থাৎ, কবি তার কবিতার ধ্বনিগুলোকে যে সুশৃঙ্খল বিন্যাসে বিন্যস্ত করে তাতে এক বিশেষ ধ্বনিসুষমা দান করেন, যার ফলে কবিতাটি পড়ার সময় পাঠক এক ধরনের ধ্বনিমাধুর্য উপভোগ করেন, ধ্বনির সেই সুশৃঙ্খল বিন্যাসকেই ছন্দ বলা হয়।

বিভিন্ন প্রকার ছন্দ সম্পর্কে জানার পূর্বে ছন্দের কিছু উপকরণ সম্পর্কে জেনে নেয়া জরুরি। আর ছন্দ সম্পর্কে পড়ার আগে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার- ছন্দ সর্বদা উচ্চারণের সাথে সম্পর্কিত, বানানের সঙ্গে নয়।

অক্ষর : (বাগযন্ত্রের) স্বল্পতম প্রয়াসে বা এক ঝোঁকে শব্দের যে অংশটুকু উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বা দল বলে। এই অক্ষর অনেকটাই ইংরেজি Syllable-র মত। যেমন-

শর্বরী- শর, বো, রী- ৩ অক্ষর

চিরজীবী- চি, রো, জী, বী- ৪ অক্ষর

কুঞ্জ- কুন, জো- ২ অক্ষর

যতি বা ছন্দ-যতি : কোন বাক্য পড়ার সময় শ্বাসগ্রহণের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে অন্তর অন্তর যে উচ্চারণ বিরতি নেয়া হয়, তাকে ছন্দ-যতি বা শ্বাস-যতি বলে।

যতি মূলত ২ প্রকার- হ্রস্ব যতি ও দীর্ঘ যতি। অল্পক্ষণ বিরতির জন্য সাধারণত বাক্য বা পদের মাঝখানে হ্রস্ব যতি দেওয়া হয়। আর বেশিক্ষণ বিরতির জন্য, সাধারণত বাক্য বা পদের শেষে দীর্ঘ যতি ব্যবহৃত হয়।

পর্ব : বাক্য বা পদের এক হ্রস্ব যতি হতে আরেক হ্রস্ব যতি পর্যন্ত অংশকে পর্ব বলা হয়। যেমন-

একলা ছিলেম। কুয়োর ধারে। নিমের ছায়া। তলে॥

কলস নিয়ে। সবাই তখন। পাড়ায় গেছে। চলে॥ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(। - হ্রস্ব যতি ও ॥ - দীর্ঘ যতি)

এখানে একলা ছিলেম, কুয়োর ধারে, নিমের ছায়া, তলে- প্রতিটিই একেকটি পর্ব; মানে প্রতিটি চরণে ৪টি করে পর্ব।

মাত্রা : একটি অক্ষর উচ্চারণে যে সময় প্রয়োজন হয়, তাকে মাত্রা বলে। বাংলায় এই মাত্রাসংখ্যার নির্দিষ্ট নয়, একেক ছন্দে একেক অক্ষরের মাত্রাসংখ্যা একেক রকম হয়। মূলত, এই মাত্রার ভিন্নতাই বাংলা ছন্দগুলোর ভিত্তি। বিভিন্ন ছন্দে মাত্রাগণনার রীতি বিভিন্ন ছন্দের আলোচনায় দেয়া আছে।

শ্বাসাঘাত : প্রায়ই বাংলা কবিতা পাঠ করার সময় পর্বের প্রথম অক্ষরের উপর একটা আলাদা জোর দিয়ে পড়তে হয়। এই অতিরিক্ত জোর দিয়ে পাঠ করা বা আবৃত্তি করাকেই বলা হয় শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর। যেমন-

আমরা আছি। হাজার বছর। ঘুমের ঘোরের। গাঁয়ে॥

আমরা ভেসে। বেড়াই স্রোতের। শেওলা ঘেরা। নায়ে॥ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এখানে প্রতিটি পর্বের প্রথম অক্ষরই একটু ঝোঁক দিয়ে, জোর দিয়ে পড়তে হয়। এই অতিরিক্ত ঝোঁক বা জোরকেই শ্বাসাঘাত বলে।

পদ ও চরণ : দীর্ঘ যতি বা পূর্ণ যতি ছাড়াও এই দুই যতির মধ্যবর্তী বিরতির জন্য মধ্যযতি ব্যবহৃত হয় । দুই দীর্ঘ যতির মধ্যবর্তী অংশকে চরণ বলে, আর মধ্য যতি দ্বারা চরণকে বিভক্ত করা হলে সেই অংশগুলোকে বলা হয় পদ। যেমন-

তরুতলে আছি। একেলা পড়িয়া ⊥ দলিত পত্র। শয়নে॥

তোমাতে আমাতে। রত ছিনু যবে ⊥ কাননে কুসুম। চয়নে॥ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(এখানে ⊥ দ্বারা মধ্যযতি চিহ্নিত করা হয়েছে।)

পূর্ণযতি দ্বারা আলাদা করা দুইটি অংশই চরণ; আর চরণের মধ্যযতি দিয়ে পৃথক করা অংশগুলো পদ। এরকম-

যা আছে সব। একেবারে ⊥

করবে অধি। কার॥ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

স্তবক : অনেকগুলো চরণ নিয়ে একটি স্তবক গঠিত হয়। সাধারণত, একটি স্তবকে একটি ভাব প্রকাশিত হয়।

মিল : একাধিক পদ, পর্ব বা চরণের শেষে একই রকম ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের ব্যবহারকে মিল বলে। অলংকারের ভাষায় একে বলে অনুপ্রাস। সাধারণত, মিল পদের শেষে থাকলেও শুরুতে বা মাঝেও মিল থাকতে পারে। পদের শেষের মিলকে অন্ত্যমিল বলে। যেমন-

মুখে দেয় জল। শুধায় কুশল। শিরে নাই মোর। হাত॥

দাঁড়ায়ে নিঝুম। চোখে নাই ঘুম। মুখে নাই তার। ভাত॥ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এখানে, প্রথম চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের শেষের পদদুটিতে অন্ত্যমিল (অল) আছে; দ্বিতীয় চরণের প্রথম দুই পদের শেষেও অন্ত্যমিল আছে (উম)। আবার দ্বিতীয় চরণের প্রথম দুই পদের শেষের ধ্বনি (ম) তৃতীয় পদের শুরুতে ব্যবহৃত হয়ে আরেকটি মিল সৃষ্টি করেছে। আর দুই চরণের শেষের পদেও অন্ত্যমিল আছে (আত)।

এবার, সুকান্ত ভট্টাচর্যের আঠারো বছর বয়স- কবিতার প্রথম দুটি স্তবকের ছন্দের এসব উপকরণ নিয়ে আলোচনা করলে বুঝতে সুবিধা হতে পারে।

আঠারো বছর। বয়স কী দুঃ। সহ॥

স্পর্ধায় নেয়। মাথা তোলবার। ঝুঁকি, ॥

আঠারো বছর। বয়সেই অহ। রহ॥

বিরাট দুঃসা। হসেরা দেয় যে। উঁকি। ॥

আঠারো বছর। বয়সের নেই। ভয়॥

পদাঘাতে চায়। ভাঙতে পাথর। বাধা,॥

এ বয়সে কেউ। মাথা নোয়াবার। নয়-॥

আঠারো বছর। বয়স জানে না। কাঁদা।॥

উপরে কবিতাটির ছন্দ যতির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এর পর্ব, পদ ও চরণ একরকম নির্দেশিত হয়েছে। প্রতিটি চরণে তিনটি পর্ব রয়েছে; প্রথম দুটি পর্ব ৬ মাত্রার, শেষ পর্বে ২ মাত্রার (মাত্রা গণনা নিচে ছন্দ অনুযায়ী আলোচনা করা আছে)। অর্থাৎ শেষ পর্বটিতে মাত্রা কম আছে। কবিতায় এরকম কম মাত্রার পর্বকে অপূর্ণ পর্ব বলে।

কবিতাটির প্রতি চারটি চরণে কোন বিশেষ ভাব নির্দেশিত হয়েছে। এগুলোকে একেকটি স্তবক বলে। যেমন, প্রথম স্তবকটিকে কবিতাটির ভূমিকা বলা যেতে পারে, এখানে কবিতাটির মূলভাবই অনেকটা অনূদিত হয়েছে। আবার দ্বিতীয় স্তবকে আঠারো বছর বয়সের, অর্থাৎ তারুণ্যের নির্ভীকতা/ভয়হীনতা বর্ণিত হয়েছে। এভাবে কবিতার একেকটি স্তবকে একেকটি ভাব বর্ণিত হয়।

আবার কবিতাটির চরণের অন্ত্যমিলের দিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে, প্রতি স্তবকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের শেষে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে অন্ত্যমিল আছে। এছাড়া চরণগুলোর ভেতরেও খুঁজলে মিল পাওয়া যাবে।

বাংলা ছন্দের প্রকারভেদ

বাংলা কবিতার ছন্দ মূলত ৩টি- স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত । তবে বিংশ শতক থেকে কবিরা গদ্যছন্দেও কবিতা লিখতে শুরু করেছেন। এই ছন্দে সেই সুশৃঙ্খল বিন্যাস না থাকলেও ধ্বনিমাধুর্যটুকু অটুট রয়ে গেছে, যে মাধুর্যের কারণে ধ্বনিবিন্যাস ছন্দে রূপায়িত হয়। নিচে সংক্ষেপে ছন্দ ৩টির বর্ণনা দেয়া হল।

স্বরবৃত্ত ছন্দ : ছড়ায় বহুল ব্যবহৃত হয় বলে, এই ছন্দকে ছড়ার ছন্দও বলা হয়।

- মূল পর্ব সবসময় ৪ মাত্রার হয়
- প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে
- সব অক্ষর ১ মাত্রা গুনতে হয়
- দ্রুত লয় থাকে, মানে কবিতা আবৃত্তি করার সময় দ্রুত পড়তে হয়

উদাহরণ-

বাঁশ বাগানের। **মা**থার উপর। **চাঁ**দ উঠেছে। **ও**ই॥ (৪+৪+৪+১)

মাগো আমার। **শো**লোক বলা। **কা**জলা দিদি। **ক**ই॥ (৪+৪+৪+১)

(যতীন্দ্রমোহন বাগচী)

এখানে bold হিসেবে লিখিত অক্ষরগুলো উচ্চারণের সময় শ্বাসাঘাত পড়ে, বা ঝোঁক দিয়ে পড়তে হয়। আর দাগাঙ্কিত অক্ষরগুলোতে মিল বা অনুপ্রাস পরিলক্ষিত হয়।

এরকম-

রায় বেশে নাচ। নাচের ঝোঁকে। মাথায় মারলে। গাঁট্টা॥ (৪+৪+৪+২)

শ্বশুর কাঁদে। মেয়ের শোকে। বর হেসে কয়। ঠাট্টা॥ (৪+৪+৪+২)

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ :

• মূল পর্ব ৪,৫,৬ বা ৭ মাত্রার হয়

• অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে ১ মাত্রা গুনতে হয়; আর অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে (য় থাকলেও) ২ মাত্রা গুনতে হয়; য় থাকলে, যেমন- হয়, কয়; য়-কে বলা যায় semi-vowel, পুরো স্বরধ্বনি নয়, তাই এটি অক্ষরের শেষে থাকলে মাত্রা ২ হয়

• কবিতা আবৃত্তির গতি স্বরবৃত্ত ছন্দের চেয়ে ধীর, কিন্তু অক্ষরবৃত্তের চেয়ে দ্রুত

উদাহরণ-

এইখানে তোর। দাদির কবর। ডালিম-গাছের। তলে॥ (৬+৬+৬+২)

তিরিশ বছর। ভিজায়ে রেখেছি। দুই নয়নের। জলে॥ (৬+৬+৬+২)

(কবর; জসীমউদদীন)

কবিতাটির মূল পর্ব ৬ মাত্রার। প্রতি চরণে তিনটি ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব এবং একটি ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব আছে।

এখন মাত্রা গণনা করলে দেখা যাচ্ছে, প্রথম চরণের-

প্রথম পর্ব- এইখানে তোর; এ+ই+খা+নে = ৪ মাত্রা (প্রতিটি অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকায় প্রতিটি ১ মাত্রা); তোর = ২ মাত্রা (অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকায় ২ মাত্রা)

দ্বিতীয় পর্ব- দাদির কবর; দা+দির = ১+২ = ৩ মাত্রা; ক+বর = ১+২ = ৩ মাত্রা

তৃতীয় পর্ব- ডালিম-গাছের; ডা+লিম = ১+২ = ৩ মাত্রা; গা+ছের = ১+২ = ৩ মাত্রা

চতুর্থ পর্ব- তলে; ত+লে = ১+১ = ২ মাত্রা

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ :

• মূল পর্ব ৮ বা ১০ মাত্রার হয়

• অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে ১ মাত্রা গুনতে হয়

• অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি আছে, এমন অক্ষর শব্দের শেষে থাকলে ২ মাত্রা হয়; শব্দের শুরুতে বা মাঝে থাকলে ১ মাত্রা হয়

• কোন শব্দ এক অক্ষরের হলে, এবং সেই অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে, সেই অক্ষরটির মাত্রা ২ হয়

• কোন সমাসবদ্ধ পদের শুরুতে যদি এমন অক্ষর থাকে, যার শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি আছে, তবে সেই অক্ষরের মাত্রা ১ বা ২ হতে পারে

• কবিতা আবৃত্তির গতি ধীর হয়

০ এই ছন্দে শোষণ শক্তি রয়েছে

উদাহরণ-

হে কবি, নীরব কেন। ফাগুন যে এসেছে ধরায়॥ (৮+১০)

বসন্তে বরিয়া তুমি। লবে না কি তব বন্দনায়॥ (৮+১০)

কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি-॥ (১০)

দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?॥ (১০)

(তাহারেই পড়ে মনে; সুফিয়া কামাল)

কবিতাটির মূল পর্ব ৮ ও ১০ মাত্রার। স্তবক দুইটি পর্বের হলেও এক পর্বেরও স্তবক আছে।

এখন, মাত্রা গণনা করলে দেখা যায়, প্রথম চরণের, প্রথম পর্ব- হে কবি, নীরব কেন; হে কবি- হে+ক+বি = ৩ মাত্রা (তিনটি অক্ষরের প্রতিটির শেষে স্বরধ্বনি থাকায় প্রতিটি ১ মাত্রা); নীরব- নী+রব = ১+২ = ৩ মাত্রা (শব্দের শেষের অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকায় সেটি ২ মাত্রা); কেন- কে+ন = ১+১ = ২ মাত্রা; মোট ৮ মাত্রা আবার দ্বিতীয় চরণের, দ্বিতীয় পর্ব- লবে না কি তব বন্দনায়; লবে- ল+বে = ২ মাত্রা; না কি তব = না+কি+ত+ব = ৪ মাত্রা; বন্দনায়- বন+দ+নায় = ১+১+২ = ৪ মাত্রা (বন- অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলেও অক্ষরটি শব্দের শেষে না থাকায় এর মাত্রা ১ হবে; আবার নায়- অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি- য় থাকায়, এবং অক্ষরটি শব্দের শেষে থাকায় এর মাত্রা হবে ২); মোট ১০ মাত্রা।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট